মায়ের হাতের রান্না

সুমিত রায়, স্ক্চ প্লেন্স্, নিউ জার্সি

বিধবা হবার তিনবছর পর মা আমেরিকায় এলেন ছেলের কাছে বেড়াতে ।

বেড়াতে এলেন বললে ঠিক বলা হবে না । যদিদং হৃদয়ং তব বলে গাঁটছড়া বাঁধার সওয়া উনপঞ্চাশ বছর পরে কর্তা বেইমানি করলেন প্রথমবার । এক বর্ষাসজল সন্ধ্যায় এই প্রথম (এবং শেষ) বারের মতো গিন্নিকে কিছু না জানিয়ে, ঠিকানা বা ফোন নম্বর না দিয়ে, খরচের টাকাকড়ি না দিয়ে চলে গেলেন কোন অচিন মুল্লুকে । মা অবশ্য পাকা গিন্নি, সতেরো বছর বয়সে বাড়ীর বৌ হয়ে এসেছেন । শ্বশুর বহুদিন মৃতদার, আধা-বৈরেগী মানুষ । সংসার চলে ভৃত্যতন্ত্রে, একুশ বছরের কলেজ-পড়ুয়া উড়নচণ্ডী কর্তা আর একটি নেহাৎই অপোগণ্ড ননদকে নিয়ে । সেই সময় থেকে সংসারের হাল ধরেছেন । শ্বশুর গেছেন, ননদের বিয়ে দেওয়া হয়েছে । মহাযুদ্ধ, মন্বন্তর, পার্টিশন, দাঙ্গা, কংগ্রেস, নকশাল, গরীবী হঠাও -- এসবের ধাক্কা সামলেছেন । দুই সন্তান বিসর্জন দিয়েছেন, অবশ্য খুবই অল্পবয়সে । সেকালে এসব হোতো । সাঙ্ঘাতিক সাঙ্ঘাতিক সব রোগ, মেনিনজাইটিস , হেনতেন, অর্ধেক সময়ে ডাক্তারেরা রোগ ধরতেই পারতো না । বড়ো ডাক্তার জবাব দিয়ে গেলে হোমিওপ্যাথিক, জলপড়া, জাগ্রত কালীর দোর ধরা, এসব করতে হোতো । মোটামুটি এসব ধাক্কা সামলাবার পর ছেলে বিদেশ গেল, ফিরে এলো না আর । কোলের মেয়েটা কাছেই থাকতো, প্রেম করে বিয়ে করেছিলো ঠিকই, কিন্তু জামাই প্রায় বাড়ীর ছেলের মতো, নাতিদুটোও দিদিমা বলতে অজ্ঞান । কর্তা অবশ্য একটু রুগ্ন ধরণের, অর্থপ্রাপ্তি না হলেও, যশলাভের মাশুল দিচ্ছিলেন বেশ কিছুদিন ধরে আলসার, হাঁপানী, হাইপারটেনশন ইত্যাদিতে ভুগে । মার কাছে এসব ম্যানেজ করা কিছুই নয়, সকালে চিনির শরবতের মতো এককাপ চা, দুপুরে এই বাংলা কাগজটা হাতে নিয়ে পনেরো মিনিট মতো একটু ঝিম -- এটুকু পেলে মা রাজ্যশাসন করে দিতে পারেন, দুজনের সংসার চালানো তো ছার । চল্লিশ বছরের মেয়েটা যখন, ''মাগো, আমার ববি-বনিকে তুমি দেখো'' বলে কোলে মাথা রেখে চলে গেলো, তখন অবশ্য ভীষণ কষ্ট হয়েছিল, মা প্রায় হাল ছেড়েই দিচ্ছিলেন । সারাজীবনের নীলের উপোস, ব্রত-পাঁচালী, কেদার-বদরী দর্শন -- কোথাও তো উত্তর-পঁয়ষট্টি সন্তানশোকের কথা, কারণ, হদিশ, নিদান, বিধান, কিছুই লেখেনি । তবে সে নিতান্তই তাৎক্ষণিক, পুরো ঘটনাটাই মা তেত্রিশকোটি ঠাকুরদের দোরে ধরে দিলেন,, কাঁচাখেকো কার কাছে কী পাপ করেছেন, জীবদ্দশায় তারই প্রায়শ্চিত্ত বলে ধার্য করে । লেগে গেলেন দুই মাতৃহারা নাতি, এবং অবশ্যই কর্তাকে নিয়ে সংসার চালাতে । আশ্চর্য কথা -- বা হয়তো অতোটা আশ্চর্যের নয় -- কর্তার পুরুষকার কিন্তু এই ব্যাপারটা তেমন মেনে নিতে পারলো না, কর্তা নিয়তির পাশার পরের দানটির চিন্তায় শরীরপাত করে ফেললেন ।

একটা কথা অবশ্য মানতেই হবে যে এই যে এতসব উত্থানপতন -- সবসময়েই কিন্তু বাধ্য ও বশংবদ কর্তা ধ্রুবকের মতো পাশে ছিলেন, প্রতি মুহূর্তে । গিন্নি দেখতেন ঘর, কর্তা বাহির -- এটা ওঁদের প্রায় প্রি-নুপশিয়াল এগ্রিমেণ্ট বলাও চলে । এবারকার ঝঞ্ঝাটটায় কর্তা না থাকায় মা একটু দিশেহারা হয়ে পড়লেন, যদিও একবারে অচল হবার মতো নয় । হিন্দুদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার নানান ঝামেলা আছে, ছেলে বিদেশ থেক সময়মতো আসতে পারলো না, কোই বাৎ নেই, মা নিজেই লড়ে গেলেন পুরুতদের কাছ থেকে বিধান নিয়ে । কর্তা যখন রাজদ্বারে যেতেন তখন বন্ধুবান্ধবের অভাব ছিলো না, দুর্ভিক্ষ আর রাষ্ট্রবিপ্লবেও দুয়েকজন থাকতেন কিন্তু এবার শ্মশানযাত্রায় তাঁদের কাউকেই দেখা গেলো না । মায়ের অবশ্য কাকচরিত্র মোটামুটি জানা আছে তাই বিচলিত হলেননা বেশী । তাছাড়া অপ্রত্যাশিত সব অন্যান্য উৎস থেকেও সাহায্য পাওয়া গেলো ।

created using
BCL easyPDF
Printer Driver
Click here to purchase a license to remove this image

এই সব ক্রিয়াকলাপ মা একরকম ঘোরের মধ্যেই কাটিয়ে দিলেন । যদিও কর্তা গত কয়েকবছর অবসর নিয়েছিলেন, এদিক-ওদিক স্মৃতিকথা লিখে সময় কাটাতেন, এককালে বাংলাদেশে বেশ যশস্বী ছিলেন । তাঁর শেষকাজ যেন সেই মানুষের উপযুক্ত হয় -- এরকম একটা চ্যালেঞ্জের ভাব খানিকটা ছিলো । মুস্কিলটা শুরু হবার কথা এসব ঝামেলা ঝঞ্ঝাট চুকেবুকে যাবার পরেই । কিন্তু মায়ের বেলায় তা হোলোনা । তার কারণ কর্তার ওপর মার অগাধ বিশ্বাস । পঞ্চাশবছর যা হয়নি, না বলে, না কয়ে এরকম দুম করে চলে যাওয়া, এটা কর্তার চরিত্রানুগ নয় মোটেই । অতএব মা এটাকে কিছুতেই মন থেকে মানতে পারলেন না । কবে কখন আবার হুট করে উপস্থিত হবেন, সেই পরিচিত কাশির আওয়াজ, ''কোথায় গেলে'', কফি চাই সময়মতো, ছগণ্ডা ওষুধ, জল, মুখশুদ্ধির লবঙ্গ -- গিন্নি ছাড়া আর তো কেউ এসব জোগান দিতে শিখলো না ! বয়েসকালে ঝগড়াঝাঁটি হলে গিন্নি আবার কর্তার জামার সব বোতাম কাঁচি দিয়ে কেটে রেখে দিতেন -- যাওনা কোথায় যাবে, দৌড় জানা আছে । বাড়ীতে বইয়ের পাহাড়, সারাজীবন খেতে পান বা নাই পান, কর্তা এই এক বদখেয়ালে টাকা ঢেলে গেলেন । তা সেসবে ধূলো পড়ে, পোকা ধরে, ঠিকমতো তদবির না করলে শখের জিনিষ নষ্ট হয়ে যায় । অতএব মা বছরদুয়েক ধরে ঘরদোর ঝাড়মোছ করে, এখানকার বই ওখানে সরিয়ে, বাসর সাজিয়ে রইলেন বসে । ছাতে ওঠা গেলে মা আকাশপ্রদীপও জ্বেলে দিতেন বলে জানি, সেটা আর হয়ে উঠলোনা অবশ্য ।

যতই করুন না কেন, একটা ফাঁক যেন কোথায় থেকে যায়, ভরে না কিছুতে । মনের কথা বলার লোক নেই, শোনাবারও নয় । প্রাক্তন বাবাজীবনের রক্তে প্রচুর তেজ, ঝটিতি শূন্য ঘর ভরে ফেলেছেন -- এবার এমন বস্তু দিয়ে যাকে অনেক দিন ধরে রাখতে পারবেন । আপিসে নতুন সায়েব এসে যেমন সবকিছু আবার ঢেলে সাজাবেই, সে ভালোমন্দ যাই হোক না কেন, নতুনের ধর্ম তো পুরাতনকে পুরোপুরি অস্বীকার করা -- তাই হোলো । নাতিদুটো দিদিমার আদরে একেবারে বখে যাচ্ছে, তাই দিদিমার আওতা থেকে সরাবার দরকার হয়ে পড়লো । তাতে করে কোন এক বৃদ্ধার জীবনের ফাঁক হাজারগুণ বেড়ে গেলো -- সেটা ঠিক হিসেবের মধ্যে আসেনা অবশ্য । তরুণ রবীন্দ্রনাথ যা বুঝেছিলেন কয়েকদিনেই, বছর দুয়েক পরে মাও উপলব্ধি করতে আরম্ভ করলেন : ''সে চলে গেল বলে গেলনা // সে কোথায় গেল ফিরে এলনা'' ।

অগত্যা তিনবছর পরে বাক্সপ্যাঁটরা গুছিয়ে, সাহসে বুক বেঁধে মা ছেলের কাছে বেড়াতে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন । বেড়াতে আসা বললে ঠিক বলা হবে না । একলা থাকা আর সহ্য হচ্ছিলো না, তাই ছেলেবৌয়ের কাছে মনের কথা বলতে, শুনাতে, শোনাতে এলেন । এ কারণটাও যথার্থ নয়, কেন নয় সেটা ক্রমশঃ প্রকাশ্য । আমার মার পক্ষে এটা সাঙ্ঘাতিক সিদ্ধান্ত, কারণ মা ইংরেজীনবিশ নন । মা গুরু পাঠশালায় পড়েছিলেন, সেকালে খুব প্রগতিশীল বাড়ীর মেয়েদেরই এমন সুবিধে হোতো । মেয়েরা ধোপার খাতা লেখা আর শ্রীচরণেষু বানান করতে শেখা -- এই পর্যন্ত এগোলেই তো যথেষ্ট । প্রথমত যাদের ছেলেপুলে মানুষ করা, হেঁশেল ঠেলা, ঝি না এলে তড়িঘড়ি দুটো বাসন মেজে নেওয়া -- এসব কর্মের জন্যই বিধাতা সৃষ্টি করেছেন, মনু বিধান দিয়েছেন, তাদের বেশী লেখাপড়া শেখাবার ব্যয়টা নিছকই অপব্যয় । তাছাড়া মনুসংহিতাতে বলাও আছে মেয়েদের বেশী লেখাপড়া শেখালে লক্ষ্মীশ্রী থাকে না । এমনকি মাতৃত্ব -- যা মেয়েদের মহীয়সী করে, স্বর্গের থেকেও গরীয়সী করে, যা তাদের জীবনের মোক্ষস্বরূপ, দেবী দুর্গার থেকে আরম্ভ করে যশোদা আর শচীমাতা, আমাদের পুরাণ আর কথা উপকথায় উদাহরণের শেষ নেই -- সেই মাতৃত্বের পূর্ণবিকাশে হানি ঘটায় । এসব অবশ্যই সেকেল বিশ্বাসের কথা, এখনকার কালে এসব আর মোটেই হয়না । এই উপপাদ্যটি সব ভারতীয় পুরুষকেই মানতে হবে, বিশেষ করে যাঁরা এদেশে এসে বিশ-তিরিশ বছর কাটিয়ে আলোকপ্রাপ্ত হয়েছেন । কী বলছেন ? ঐ মাতৃত্বের ব্যাপারটা একেবারে উপেক্ষা করা যায় না বলছেন । অনেকটা পিতৃত্বের মতো ? হতেও পারে । সেকালের মেয়েদের বুদ্ধিশুদ্ধি অতো ছিলো না, দৌড় তো ঐ গুরু পাঠশালা পর্যন্ত, তাই এঁরাও বোঝাতেন, আর ওঁরাও তেমনটি বুঝে বসে থাকতেন । আজকালকার মেয়েরা অনেক বেশী সেয়ানা, মাতাজী ছিলেন আমাদের রাষ্ট্রের প্রধান । তা কোন অজপাড়াগাঁয়ে দুয়েকটা সতীদাহ বা ডাউরি

created using
BCL easyPDF
Printer Driver
Click here to purchase a license to remove this image

ডেথ -- এতো বড়ো ভারতবর্ষে ওরকম দুচারটে ঘটনা ঘটেই থাকে, আর এই বিশ্বনিন্দুকেরা তাই নিয়ে ফেনিয়ে ফেনিয়ে পাতা ভর্তি লিখে ফেলে, ওসব ছোট কথায় কান দেবেন না ।

যাকগে, মায়ের আর ইংরেজীটা শেখা হয়নি । কর্তা থাকতে কোনো পরোয়া ছিলোনা, দুবার আমেরিকা, একবার আধা পৃথিবীটা ঘুরে গেছেন । ''নো ইংলিশ -- হাজব্যাণ্ড'' এবং অঙ্গুলিসঙ্কেত, এতেই দিব্যি কাজ চলিয়ে দিয়েছেন । কর্তা না থাকাটাই একটু ঝামেলা এবারে । তাও কর্তার সঙ্গে একটু পরামর্শ হোলো, ''কিগো, ছেলে বলছে, যাবো? তুমি কিন্তু সঙ্গে থেকো বাপু, বিপদে ফেলোনা শেষ পর্যন্ত'' । তারপর ছেলের জন্য কুচোগজা, বৌয়ের মুড়ির মোয়া, নাতিনাতনীর জামাকাপড় -- এসব গুছিয়ে, ননদের কাছে বাড়ীর চাবি ধরিয়ে মা প্লেনে চড়লেন । পাখীটাও সম্প্রতি মারা গেছে, তাই সে কারণে আর কারুর দোর ধরতে হোলো না । কর্তা সব ঠিকমতোই শুনেছিলেন বোধহয়, প্লেনে এক চিন্তামণিও জুটে গেলো, বাবা-বাছা বলে মা সহযাত্রীকে দিয়ে দরকারী সব কাজ করিয়ে নিলেন, ফর্ম ভর্তি করা, এইসব আর কি । তারপর দুটো সুটকেস ভরা গাড়ী ঠেলতে ঠেলতে, ভয়ার্ত হরিণীর মতো এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে মা শেষে ছেলের জিম্মায় পৌঁছে গেলেন ।

তারপর তো এক সপ্তাহ খানেক গেলো কান্নার সাগর পার হতে । যাদের কাছে মা বেড়াতে এলেন, তাদের জীবন বয়ে চলছে নিস্তরঙ্গ, আপিস-বাড়ী-টিভি-ঘাসের তদবির এরই ছকবাঁধা খাতে । এদিকে মার জীবনে যে কতো কিছু ঘটে গেলো, সেসব কথা এতোদিন পাথরচাপা ছিলো, এবারে মুক্তবেণী । মার হার্ট ভালো নয়, নীচের ঘরেই স্থিতু হলেন, আস্তে আস্তে ঐ কান্নাকাটির মধ্যেই হাঁড়ি-কুঁড়ি, কফির জোগাড়, ছেলে সকালে কী খেয়ে আপিস যায় -- এসবের খোঁজখবর নিয়ে ফেললেন ।

এইরকম সময়ে এক আপিসের সকালে মুখ ভেটকে অখাদ্য সিরিয়াল ততোধিক অখাদ্য মাঠাতোলা দুধ, স্কিম মিল্ক, দিয়ে খাচ্ছি । মা অবশ্যই সামনে বসে, ছেলের ওষুধের বড়ি বাছছেন, লবঙ্গ বাছছেন , ইত্যাদি । মাকে বললাম , ও মা, আজ রাত্তিরে একটু চিংড়িমাছের বাটি চচ্চড়ি কোরো না গো, অনেকদিন খাই না । মা মুখটা একটু ফিরিয়ে নিলেন । চোখের জলটা সামলানো গেলে বললেন, জানিস, কতোদিন পরে আজ আমার সন্ধ্যে অবধি বেঁচে থাকার একটা কারণ আছে । ও হরি, চোখের জলটা দুঃখের নয়, সুখের ! এতক্ষণ পরে মায়ের ছেলের কাছে আসার কারণটা ধরতে পারলেন ? বেড়াতে আসা, নিঃসঙ্গতা , এসব গৌণ কারণ । জ্ঞানবুদ্ধি হবার পর থেকেই মা করে এসেছেন পরের সেবাই বলুন আর খিদমৎগারিই বলুন, ঐ হয়ে গেছে তাঁর ধর্ম, কর্ম, প্রকৃতি । কর্তার সঙ্গে এই তিনবছরের বিচ্ছেদ আরম্ভ হবার পর যতদিন নাতিগুলোরও তদবির তদারক করা যেতো, ততদিন মা সামলে নিয়েছিলেন, কিন্তু ওরা চলে যাওয়ার পরে আর কারুকে সেবা দিতে না পেরে, শুধু নিজের সেবা করে মা ভরকেন্দ্র হারিয়ে ফেললেন -- এ যে প্রকৃতিবিরুদ্ধ, তৃণভোজীকে সমুদ্রে ছেড়ে মৎস্যাশী হতে বলা! মা তাই আর থাকতে পারলেন না, তাই পালিয়ে এলেন কাউকে সেবা দেবার জন্য । ভেবে দেখুন, সত্তর বছরের বৃদ্ধা, বাপের বাড়ীর অবস্থা ভালো ছিল না, তারপর উনিশশোবিশ সালে মধ্যবিত্ত বাঙালী বাড়ীতে তৃতীয় কন্যা -- আঁতুড়ে নুন খাওয়ানোর প্রথা, তার বদলে বছর পাঁচেক বয়েস থেকে ফাইফরমাস খাটতে হোতো । অর্থাৎ জীবনে প্রায় ষাট বা পঁয়ষট্টি বছর কাটিয়ে এলেন পরের সেবা করে, নিজের বলে কিছু রইলো না, না ব্যক্তিত্ব, না অস্তিত্ব । স্বর্গাদপি গরীয়সী টরীয়সী, কীসব সংস্কৃত বুলি যে ঝাড়া হচ্ছিলো খুব, এ ব্যাপারটায় এবারে একটু আলোকসম্পাত করুন ।

যাকগে, কী বলতে কী বলে ফেলি, শুরু করেছিলাম রান্নার গল্প । সন্ধ্যেবেলায় ফিরে এসে মায়ের হাতের রান্না বাটিচচ্চড়ি সাজিয়ে বসা গেলো । মা আগে থেকেই নানান অজুহাত শানিয়ে রেখেছেন, -- এখানকার মশলাপাতি ভালো নয়, উনুন সামলাতে জানিনা, ইত্যাদি, ইত্যাদি -- কে জানে বাপু, এতোদিন বিদেশে থেকে ছেলের চালচলন যেমন বদলেছে, তেমনি খাওয়া-দাওয়ার স্বাদও কি

created using
BCL easyPDF
Printer Driver
Click here to purchase a license to remove this image

আর তেমনটি আছে ! অবশেষে বাটিচচ্চড়ি মুখে উঠলো । একী, কোনো স্বাদ নেই কেন, স্বাদ পাচ্ছিনা কেন ?

পাচ্ছিনা তার কারণ হোলো যে, রান্না মুখে পৌঁছবার আগেই, গন্ধ নাকে আসতেই চারযুগের ওপার থেকে স্মৃতির এক জলোচ্ছ্বাস এসে আমায় যে নিয়ে গেলো ভাসিয়ে । চোখও বুঁজতে হোলো না, বাটিচচ্চড়ি মুখে দিয়েই পৌঁছে গেলাম বালিগঞ্জ প্লেসের ভাড়াবাড়ীতে । সেখানে আমার ছোটো বোন বেঁচে আছে, বেড়াচ্ছে নেচে, আমার চোখের সামনে সম্মুখস্থা বিধবা বৃদ্ধা হয়ে গেলেন তরুণী, ঐ যে যাঁর ললাটের সিঁদুর নিয়ে ভোরের রবি ওঠে, আলতা পরা পায়ের ছোঁয়ায় রক্তকমল ফোটে ! সেই বাটিচচ্চড়িতে ঝাল নেই, সেখানে জীবন বড়ো সুন্দর, সুখী পরিবার, বাবু রোজ রাতে বাড়ী ফিরলে আমরা সবাই খেতে বসি, মা রান্না করে, মা পরিবেশন করে, মাঝে মাঝেই আমি ভাতের থালার ওপরেই ঘুমিয়ে পড়ি, তখন মা আমাকে খাইয়ে দেয় । ইসকুল আছে, মজা, ফুটবল খেলা আছে, সেটাও মজা, মাস্টারমশাইই ছন্দপতন, কিন্তু সেখানে শনি–রবিবার বাবু, মা, বোনটি, আমি –– আমরা সবাই ময়দানে এগ্‌জিবিশন দেখতে যাই ! এর মধ্যে বাটিচচ্চড়ি যে কোথায় হারিয়ে গেলো, কে তার খোঁজ রাখে ।

তারপর যতোদিন মা রইলেন, ততদিন, রোজ রোজ আমি স্মৃতির ঢেউয়ে ভেসে ভেসে আমার ছোটোবেলায় ঘুরে এলাম । তাতে করে বাটিচচ্চড়ির স্বাদ যদি নাই পাওয়া গেলো, তো না পাওয়া গেলো । আমি যা পেলাম, যা ফিরে পেলাম তার দাম অনেক অনেক বেশী । যে তিনমাস মা রইলেন আমার কাছে, সেই তিনমাসে আমি এক ধ্রুব সত্য আবিষ্কার করলাম –– সেটা হোলো, মায়ের হাতের রান্নায় স্বাদ নেই আছে স্মৃতি । বিস্বাদ নয় ঠিক, নিশ্চয় নয় বিস্মৃতি । আপনারা কী বলেন ?

পুনশ্চ –– তিনমাস পরে মা পাকাপাকি ছেলের কাছে থাকবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফিরে গেলেন, ঘরদোরের বন্দোবস্ত করে আসবেন বলে । তারপর এলেন না আর; ছোটো নাতি মার কাছে থেকে কলেজে পড়াশোনা করতে এলো (ততদিনে ওপক্ষ হয় ছেলের আখের নিয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছেন বা গুছিয়ে ফেলেছেন, অবান্তর কথা) । মা রয়ে গেলেন দেশেই । ঐ যে সেবা করার আধার পাওয়া গেলো আবার নতুন করে ।

এমনও হতে পারে যে দিদিমা তো বেঁচে নেই, মা কার হাতের স্বাদহীন রান্না খেয়ে স্মৃতির সাগরে ভেসে যাবে? সওয়া পঞ্চাশবছরের অনেক স্মৃতি মশায়, অতো চট করে কি ফেলে দেওয়া যায়?

created using
BCL easyPDF
Printer Driver
Click here to purchase a license to remove this image